لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ
مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
شَهِيْدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ
اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ الَّيْلِ
فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿٤٠﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ
قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾ يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾
اِنَّا نَحْنُ نُحْىٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ
سِرَاعًا ۗ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ
اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۚ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾

سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ سِتُّوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ﴿١﴾ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمٰتِ
اَمْرًا ﴿٤﴾ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾

(৩৫) তারা তথায় যা চাইবে, তাই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক। (৩৬) আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত। তাদের কোন পলায়ন স্থান ছিল না। (৩৭) এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। (৩৮) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (৩৯) অতএব, তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্যে আপনি ছবর করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন, (৪০) রাত্রির কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পশ্চাতেও। (৪১) শুন, যে দিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে, (৪২) যেদিন মানুষ নিশ্চিত সেই ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পাবে, সেদিনই পুনরুত্থান দিবস। (৪৩) আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। (৪৪) যেদিন ভূমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটাছুটি করে বের হয়ে আসবে। এটা এমন সমবেত করা, যা আমার জন্যে অতি সহজ। (৪৫) তারা যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন। অতএব, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন।

সূরা আয-যারিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৬০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে—

(১) কসম ঝঞ্ঝাবায়ুর, (২) অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের, (৩) অতঃপর মৃদু চলমান জলযানের, (৪) অতঃপর কর্ম বন্টনকারী ফেরেশতাগণের, (৫) তোমাদের প্রদত্ত ওয়াদা অবশ্যই সত্য। (৬) ইনসাফ অবশ্যম্ভাবী।

উপস্থিত রাখবে, তাঁর সামনে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকবে এবং মনের কুবাসনা পরিত্যাগ করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا —অর্থাৎ, জান্নাতীরা জান্নাতে যা চাইবে, তাই পাবে। অর্থাৎ, চাওয়া মাত্রই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। বিলম্ব ও অপেক্ষার বিড়ম্বনা সইতে হবে না। হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ জান্নাতে কারও সন্তানের বাসনা হলে গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের কায়িক বৃদ্ধি এগুলো সব এক মুহূর্তের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়ে যাবে।—(ইবনে-কাসীর)।

وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ —অর্থাৎ, আমার কাছে এমন নেয়ামতও আছে, যার কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। ফলে তারা এগুলোর আকাঙ্খাও করতে পারবে না। হযরত আনাস ও জাবের (রাঃ) বলেনঃ এই বাড়তি নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার দীদার তথা সাক্ষাত, যা জান্নাতীরা লাভ করবে। لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ আয়াতের তফসীরে এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জান্নাতীরা প্রতি শুক্রবার আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাত লাভ করবে।—(কুরতুবী)।

فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ - فَنَقَّبُوْا শব্দটি تنقيب থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিদ্র করা, বিদীর্ণ করা। বাক-পদ্ধতিতে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

مَّحِيْصٍ এর অর্থ আশ্রয়স্থল। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা তোমাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল এবং যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। কিন্তু দেখ পরিণামে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কোন ভূখণ্ড অথবা গৃহ তাদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে আশ্রয় দিতে পারল না।

জ্ঞানার্জনের দুই পন্থা ঃ لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ —হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ এখানে "কলব" বলে বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। বোধশক্তির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কলব তথা অন্তঃকরণ। তাই একে কলব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এখানে কলব বলে হায়াত তথা জীবন বোঝানো হয়েছে। কারণ, কলবের উপরই হায়াত ভিত্তিশীল। আয়াতের অর্থ এই যে, এই সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা সেই ব্যক্তিই উপদেশ ও শিক্ষার উপকার লাভ করতে পারে, যার বোধশক্তি অথবা হায়াত আছে। বোধশক্তিহীন অথবা মৃত ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ - القاء سمع এর অর্থ কোন কথা কান লাগিয়ে শোনা এবং شَهِيْدٌ এর অর্থ উপস্থিত। উদ্দেশ্য এই যে, দুই ব্যক্তি উল্লেখিত আয়াতসমূহের দ্বারা উপকার লাভ করে। (এক) যে স্বীয় বোধশক্তি দ্বারা সব বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে (দুই) অথবা সে আয়াতসমূহকে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে ; অন্তরকে অনুপস্থিত রেখে শুধু কানে শুনে না। তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছেঃ কামেল বুযুর্গগণ প্রথমোক্ত প্রকারের মধ্যে এবং তাঁদের অনুসারী ও মুরিদগণ দ্বিতীয়

প্রকারের মধ্যে দাখিল।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ – سَبِّحْ শব্দটি تسبيح থেকে উদ্ভূত। অর্থ আল্লাহ্ তাআলার তসবীহ্ (পবিত্রতা বর্ণনা) করা। মুখে হোক কিংবা নামাযের মাধ্যমে হোক। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন ঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে তসবীহ্ করার অর্থ ফজরের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তসবীহ্ করার মানে আছরের নামায। হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ্র বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

চেষ্টা কর, যাতে তোমার সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযগুলো ফওত না হয়ে যায়, অর্থাৎ, ফজর ও আছরের নামায। এর প্রমাণ হিসেবে জরীর উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন।—(কুরতুবী)।

সেসব তসবীহ্ও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সকাল-বিকাল পাঠ করার প্রতি সহীহ্ হাদীসসমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশত বার করে 'সোবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী' পাঠ করে, তার গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশী হয়।—(মাযহারী)।

وَأَدْبَارَ السُّجُودِ —হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ سجود বলে ফরয নামায বোঝানো হয়েছে এবং পশ্চাতে বলে সেইসব তসবীহ্ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর ফযীলত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েত ; রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সোবহানাল্লাহ্ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং এক বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' পাঠ করবে, তার গোনাহ্ মাফ করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান হয়।-(বোখারী-মুসলিম) ফরয নামাযের পরে যেসব সুন্নত নামায পড়ার কথা সহীহ্ হাদীসমূহে বর্ণিত আছে, وَأَدْبَارَ السُّجُودِ বলে সেগুলোও বোঝানো যেতে পারে।—(মাযহারী)।

يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ —অর্থাৎ, যেদিন আহ্বানকারী ফেরেশতা নিকট থেকেই আহ্বান করবে। ইবনে-আসাকির জায়েদ ইবনে-জাবের থেকে বর্ণনা করেন, এই ফেরেশতা আর কেউ নয়—স্বয়ং ইসরাফীল। তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসের সখরায় দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের মৃতদেরকে এই বলে সম্বোধন করবেন ঃ হে পচাগলা চামড়াসমূহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্থিসমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ! শুন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে হিসাবের জন্যে সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন।—(মাযহারী)।

আয়াতে কেয়ামতের দ্বিতীয় ফুঁৎকার বর্ণিত হয়েছে, যাদ্বারা বিশ্বজগতকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। নিকটবর্তী স্থানের অর্থ এই যে, তখন এই আওয়াযটি নিকটের ও দূরের সবাই এমনভাবে শুনবে, যেন কানের কাছ থেকেই বলা হচ্ছে। হযরত ইকরিমা (রাঃ) বলেন ঃ আওয়াযটি এমনভাবে শোনা যাবে, যেন কেউ আমাদের কানেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন ঃ নিকটবর্তী স্থানের অর্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরা। এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুর্দিক থেকে এর দূরত্ব সমান।—(কুরতুবী)।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا —অর্থাৎ, যখন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে সব মৃত বের হয়ে আসবে এবং ছুটাছুটি করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, সবাই শাম দেশের দিকে দৌড়তে থাকবে। সেখানে বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় ইসরাফীল (আঃ) সবাইকে আহ্বান করবেন।

তিরমিযীতে মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শাম দেশের দিকে ইশারা করে বলেন ঃ

من ههنا الى ههنا تحشرون ركبانا ومشاة وتجرون على وجوهكم يوم القيامة

এখান থেকে সেই পর্যন্ত তোমরা উত্থিত হবে। কেউ সওয়ার হয়ে, কেউ পদব্রজে এবং কেউ উপুড় হয়ে কেয়ামতের ময়দানে নীত হবে।

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ —অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে আপনি কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিন।" উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রচারকার্য ব্যাপক হলেও একমাত্র তারাই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে, যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে।

হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) এই আয়াত পাঠ করে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন ঃ

اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يابر يارحيم

হে আল্লাহ্, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার ওয়াদার আশা করে। হে ওয়াদাপূরণকারী, হে দয়াময়।

সূরা আয-যারিয়াত

সূরা যারিয়াতেও পূর্বেকার সূরা ক্বাফ-এর ন্যায় বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু পরকাল, কেয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং সওয়াব ও আযাব সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কতিপয় বস্তুর কসম খেয়ে বলেছেন যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত কেয়ামত সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি সত্য। মোট চারটি বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে। (এক) وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (দুই) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (তিন) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا এবং (চার) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا

ইবনে-কাসীরের মতে অগ্রাহ্য একটি হাদীস এবং হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) ও আলী মোর্তাযা (রাঃ)-এর উক্তিতে এই বস্তু চতুষ্টয়ের তফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

ذاريات বলে ধূলিকণা বিশিষ্ট ঝঞ্ঝাবায়ু বোঝানো হয়েছে। حاملات وقرا -এর শাব্দিক অর্থ বোঝাবাহী ; অর্থাৎ, যে মেঘমালা বৃষ্টির বোঝা বহন করে। جاريات يسرا বলে পানিতে স্বচ্ছলগতিতে চলমান জলযান বোঝানো হয়েছে। مقسمات امرا এর অর্থ সেইসব ফেরেশতা, যারা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধিলিপি অনুযায়ী রিযিক, বৃষ্টির পানি এবং কষ্ট ও সুখ বণ্টন করে।—(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, দুররে-মনসূর)।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝٧ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝٨ يُّؤْفَكُ عَنْهُ
مَنْ اُفِكَ ۝٩ قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۝١١
يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٢ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۝١٣ ذُوْقُوْا
فِتْنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝١٤ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ
وَّعُيُوْنٍ ۝١٥ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ
مُحْسِنِيْنَ ۝١٦ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۝١٧ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝١٨ وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝١٩ وَفِي
الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۝٢٠ وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝٢١ وَفِي
السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ۝٢٢ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ
مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ۝٢٣ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ
الْمُكْرَمِيْنَ ۝٢٤ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۝٢٥
فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ۝٢٦ فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا
تَاْكُلُوْنَ ۝٢٧ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ
عَلِيْمٍ ۝٢٨ فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ
عَقِيْمٌ ۝٢٩ قَالُوْا كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝٣٠

(৭) পথবিশিষ্ট আকাশের কসম, (৮) তোমরা তো বিরোধপূর্ণ কথা বলছ। (৯) যে ভ্রষ্ট, সেই এ থেকে মুখ ফিরায়, (১০) অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, (১১) যারা উদাসীন, ভ্রান্ত। (১২) তারা জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে হবে? (১৩) যে দিন তারা অগ্নিতে পতিত হবে, (১৪) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা একেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। (১৫) খোদাভীরুরা জান্নাতে ও প্রস্রবণে থাকবে। (১৬) এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় ইতিপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, (১৭) তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, (১৮) রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত, (১৯) এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল। (২০) বিশ্বাসকারীদের জন্যে পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২১) এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (২২) আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সবকিছু। (২৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, তোমাদের কথাবার্তার মতই এটা সত্য। (২৪) আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? (২৫) যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ সালাম, তখন সে বলল ঃ সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক। (২৬) অতঃপর সে গৃহে গেল এবং একটি ঘৃতেপক্ক মোটা গোবৎস নিয়ে হাযির হল। (২৭) সে গোবৎসটি তাদের সামনে রেখে বলল ঃ তোমরা আহার করছ না কেন? (২৮) অতঃপর তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হল ঃ তারা বলল ঃ ভীত হবেন না। তারা তাঁকে একটি জ্ঞানীগুণী পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল। (২৯) অতঃপর তাঁর স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এল এবং মুখ চাপড়িয়ে বলল ঃ আমি তো বৃদ্ধা, বন্ধ্যা। (৩০) তারা বলল ঃ তোমার পালনকর্তা এরূপই বলেছেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ – حبكة শব্দটি حبك এর বহুবচন। এর অর্থ কাপড় বয়নে উদ্ভূত পাড়। এটা পথসদৃশ হয় বলে পথকেও حبك বলা হয়। অনেক তফসীরবিদের মতে এস্থলে এই অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, পথবিশিষ্ট আকাশের কসম। পথ বলে এখানে ফেরেশতাদের যাতায়াতের পথ এবং তারকা ও নক্ষত্রের কক্ষপথ উভয়ই বোঝানো যেতে পারে।

বয়নে উদ্ভূত পাড় কাপড়ের শোভা ও সৌন্দর্যও হয়ে থাকে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে حبك এর অর্থ নিয়েছেন শোভা ও সৌন্দর্য। আয়াতের অর্থ এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশের কসম। যে বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্যে এখানে কসম খাওয়া হয়েছে, তা এই ঃ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ —বাহ্যতঃ এতে মুশরিকদের-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ব্যাপারে বিভিন্নরূপ উক্তি করত এবং কখনও উন্মাদ, কখনও যাদুকর, কখনও কবি ইত্যাদি বাজে পদবী সংযুক্ত করত। মুসলিম ও কাফের নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে এখানে সম্বোধন করার সম্ভাবনাও আছে; তখন "বিভিন্ন রূপ উক্তির" অর্থ হবে এই যে, তাদের মধ্যে কেউ তো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে সত্যবাদী মনে করে এবং কেউ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে।—(মাযহারী)।

يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ – اُفِكَ -এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো। عَنْهُ এর সর্বনামে দু'টি আলাদা আলাদা সম্ভাবনা আছে। (এক) এই সর্বনাম দ্বারা কোরআন ও রসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন ও রসূল থেকে সেই হতভাগাই মুখ ফেরায়, যার জন্যে বঞ্চনা অবধারিত হয়ে গেছে।

(দুই) এই সর্বনাম দ্বারা قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ (বিভিন্ন উক্তি) বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের বিভিন্নরূপ ও পরস্পর বিরোধী উক্তির কারণে সেই ব্যক্তিই কোরআন ও রসূল থেকে মুখ ফেরায়, যে কেবল হতভাগ্য ও বঞ্চিত।

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ – خراص -এর অর্থ অনুমানকারী, যে ব্যক্তি অনুমানের উপর ভিত্তি করে কথা বলে। এখানে সেই কাফের ও অবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কোন প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি করত। কাজেই এর অনুবাদে "মিথ্যাবাদীর দল" বললেও অযৌক্তিক হবে না। এই বাক্যে তাদের জন্যে অভিশাপের অর্থে বদদোয়া রয়েছে।—(মাযহারী) কাফেরদের আলোচনার পর কয়েক আয়াতেই মুমিন ও পরহেযগারদের আলোচনা করা হয়েছে।

এবাদতে রাত্রি জাগরণ ও তার বিবরণ ঃ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ – يَهْجَعُوْنَ -শব্দটি هجوع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া। এখানে মুমিন পরহেযগারদের এই গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় এবং অধিক জাগ্রত থাকে। ইবনে জরীর এই তফসীর করেছেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে তাই বর্ণিত আছে যে, পরহেযগারগণ রাত্রিতে জাগরণ ও এবাদতের ক্লেশ স্বীকার করে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। হযরত

ইবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ, মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে ما শব্দটি 'না' বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাত্রির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশে নামায ইত্যাদি এবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোন অংশে এবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়ে, হযরত আনাস ও আবুল আলিয়া (রাঃ)-এর মতে সে-ও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু জাফর বাকের (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)।

রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার বরকত ও ফযীলত ঃ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ —অর্থাৎ, মুমিন পরহেযগারগণ রাত্রির শেষপ্রহরে গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। اسحار শব্দটি سحر এর বহুবচন। এর অর্থ রাত্রির ষষ্ঠপ্রহর। এই প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনা করার ফযীলত অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে ঃ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ —সহীহ্ হাদীসের সব কয়টি কিতাবেই এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন। (কিভাবে বিরাজমান হন, তার স্বরূপ কেউ জানে না।) তিনি ঘোষণা করেন ঃ কোন তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবুল করব? কোন ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব?—(ইবনে-কাসীর)।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শেষপ্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনার আয়াতে সেইসব পরহেযগারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বিবৃত করা হয়েছে যে, তারা রাত্রিতে আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে মশগুল থাকে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। এমতাবস্থায় ক্ষমাপ্রার্থনা করার বাহ্যতঃ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করা হয়। যারা সমগ্র রাত্রি এবাদতে অতিবাহিত করে, তারা শেষ রাত্রে কোন্ গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে?

জওয়াব এই যে, তাঁরা আল্লাহ্ তাআলার আধ্যাত্মজ্ঞানে জ্ঞানী এবং আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরা তাঁদের এবাদতকে আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্যের পক্ষে যথোপযুক্ত মনে করেন না। তাই এই ত্রুটি ও অবহেলার কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।—(মাযহারী)।

সদকা-খয়রাতকারীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ ঃ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ বলে এমন দরিদ্র অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে। আয়াতে মুমিন-মুত্তাকীদের এই গুণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার পথে ব্যয় করার সময় কেবল ভিক্ষুক অর্থাৎ, স্বীয় অভাব প্রকাশকারীদেরকেই দান করে না ; বরং যারা স্বীয় অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না, তাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে এবং তাদের খোঁজ-খবর নেয়।

বলাবাহুল্য, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন-মুত্তাকিগণ কেবল দৈহিক এবাদত তথা নামায ও রাত্রি জাগরণ করেই ক্ষান্ত হয় না ; বরং আর্থিক এবাদতেও অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ভিক্ষুকদের ছাড়া তারা এমন লোকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে, যারা ভদ্রতা রক্ষার্থে নিজেদের অভাব কাউকে জানায় না। কিন্তু কোরআন পাক এই আর্থিক এবাদত وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, তারা যেসব ফকীর ও মিসকীনকে দান করে, তাদের কাছে নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে বেড়ায় না ; বরং এরূপ মনে করে দান করে যে, তাদের ধন-সম্পদে এই ফকীরদেরও অংশ ও হক আছে এবং হকদারকে তার হক দেয়া কোন অনুগ্রহ হতে পারে না ; বরং এতে স্বীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার সুখ রয়েছে।

বিশ্বচরাচর ও ব্যক্তিসত্তা উভয়ের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী রয়েছে ঃ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ —অর্থাৎ, বিশ্বাসকারীদের জন্যে পৃথিবীতে কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে। (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে কাফেরদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর মুমিন পরহেযগারদের অবস্থা, গুণাবলী ও উচ্চ মর্তবা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আবার কাফের ও কেয়ামত অবিশ্বাসকারীদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার এবং আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করে অস্বীকারে বিরত হওয়ার নির্দেশ দান করা হচ্ছে। অতএব, এই বাক্যের সম্পর্ক পূর্বোল্লেখিত إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ বাক্যের সাথে রয়েছে, যাতে কোরআন ও রসূলকে অস্বীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

তফসীর-মাযহারীতে একেও মুমিন-মুত্তাকীদেরই গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে এবং موقنين-এর অর্থ আগের متقين-ই করা হয়েছে। এতে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা পৃথিবী ও আকাশের দিগন্তে বিস্তৃত আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় ; যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

পৃথিবীতে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগ-বাগিচাই দেখুন, এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ, এক একটি পত্রের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ার হাজারো বৈচিত্র্য রয়েছে। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠে নদীনালা কূপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিগুহা রয়েছে। মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও তাদের বিভিন্ন উপকারীতা রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য, চরিত্র ও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার কুদরত ও হিকমতের এত বিকাশ দৃষ্টিগোচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন।

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ —এস্থলে নিদর্শনাবলীর বর্ণনায় আকাশ ও শূন্য জগতের সৃষ্টবস্তুর কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপৃষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাফেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠের সৃষ্টবস্তুও বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা করলে এক একটি অঙ্গকে আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের এক একটি পুস্তক দেখতে পাবে। তোমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেসবই যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সংকুচিত হয়ে বিদ্যমান হয়েছে। একারণেই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে আল্লাহ্ তাআলাকে যেন সে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

কিভাবে এককোঁটা বীর্য বিভিন্ন ভূখণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সূক্ষ্ম উপাদানের নির্যাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়? অতঃপর কিভাবে বীর্য থেকে একটি জমাট রক্ত তৈরী হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড প্রস্তুত হয়? এরপর কিভাবে তাতে অস্থি তৈরী করা হয় এবং অস্থিকে মাংসে পরানো হয়? অতঃপর কিভাবে এই নিষ্প্রাণ পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়ার আলো বাতাসে আনয়ন করা হয়? এরপর কিভাবে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এই জ্ঞানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে একজন সুধী ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং কিভাবে মানুষের আকার-আকৃতিকে বিভিন্নরূপ দান করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিগোচর হয়? এই কয়েক ইঞ্চির পরিধির মধ্যে এমন এমন স্বাতন্ত্র্য রাখার সাধ্য আর কার আছে? এরপর মানুষের মন ও মেজাযের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একত্ব সেই আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের লীলা, যিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম। فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

এসব বিষয় প্রত্যেক মানুষ বাইরে ও দূরে নয়—স্বয়ং তার অস্তিত্বের মধ্যেই দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আল্লাহ্ তাআলাকে সর্বশক্তিমান স্বীকার না করে তবে, তাকে অন্ধ ও অজ্ঞান বলা ছাড়া উপায় নেই। একারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা কি দেখ না? এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তেমন বেশী জ্ঞানবুদ্ধি দরকার হয় না, দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ অর্থাৎ, আকাশে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত বিষয় রয়েছে। এর নির্মল ও সরাসরি তফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশে থাকার অর্থ "লওহে-মাহফুযে" লিপিবদ্ধ থাকা। বলাবাহুল্য প্রত্যেক মানুষের রিযিক, প্রতিশ্রুত বিষয় এবং পরিণাম সবই লওহে-মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে।

اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা যেমন নিজেদের কথাবার্তা বলার মাধ্যমে কোন সন্দেহ কর না, কেয়ামতের আগমনও তেমনি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আস্বাদন করা, স্পর্শ করা ও ঘ্রাণ লওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভাবে কথা বলাকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, উপরোক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে ধোঁকা হয়ে যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত লাগে, কিন্তু বাকশক্তিতে কখনও কোন ধোঁকা ও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই।—(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াত থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর সান্ত্বনার জন্যে অতীত যুগের কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

فَقَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ ফেরেশতাগণ বলেছিল سَلٰمًا ইবরাহীম (আঃ) জওয়াবে বললেন سَلٰمٌ কেননা, এতে সার্বক্ষণিক শান্তির অর্থ নিহিত রয়েছে। কোরআন পাকে নির্দেশ আছে, সালামের জওয়াব সালামকারী ভাষা অপেক্ষা উত্তম ভাষায় দাও। ইবরাহীম (আঃ) এভাবে সেই নির্দেশ পালন করলেন।

قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ – منكر শব্দের অর্থ অপরিচিত। ইসলামে গোনাহের কাজও অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই গোনাহ্কেও منكر বলা হয়। বাক্যের অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদেরকে চিনতে পারেননি। তাই মনে মনে বললেন ঃ এরা তো অপরিচিত লোক। এটাও সম্ভবপর যে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মেহমানদেরকে শুনিয়েই একথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা।

فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ – راغ শব্দটি روغ থেকে উদ্ভূত। অর্থ গোপনে চলে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আঃ) মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্যে এভাবে গৃহে থেকে চলে গেলেন যে, মেহমানরা তা টের পায়নি। নতুবা তারা একাজে বাধা দিত।

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ অর্থাৎ, ইবরাহীম (আঃ) তাদের না খাওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে শংকাবোধ করতে লাগলেন। কেননা, তখন ভদ্র সমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না, কিছু আহার্য গ্রহণ করত। কোন মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশে আগমনকারী শত্রু বলে আশংকা করা হত। সেই যুগের চোর-ডাকাতদেরও এতটুকু ভদ্রতা জ্ঞান ছিল যে, তারা যার বাড়ীতে কিছু খানা খেত, তার ক্ষতিসাধন করত না। তাই না খাওয়া বিপদাশংকার কারণ ছিল।

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ এর অর্থ অসাধারণ আওয়াজ। কলসের শব্দকে صرير বলা হয়। হযরত সারা যখন শুনলেন যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে পুত্র-সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিতেছে, আর একথা বলাই বাহুল্য যে, সন্তান স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে; তখন তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যে। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ অর্থাৎ, প্রথমতঃ আমি বৃদ্ধা, এরপর বন্ধ্যা। যৌবনেও আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না। এখন বার্ধক্যে এটা কিরূপে সম্ভব হবে? জওয়াবে ফেরেশতাগণ বলল ঃ كَذٰلِكِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সবকিছু করতে পারেন। এ কাজও এমনিভাবেই হবে। এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, তখন হযরত সারার বয়স নিরানব্বই বছর এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বয়স একশত বছর ছিল।—(কুরতুবী)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا
أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُسَوَّمَةً
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً
لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ
فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ
إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ
عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا
حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَ
هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾
وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾ وَ
السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا
فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾

(৩১) ইবরাহীম বলল ঃ হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি? (৩২) তারা বলল ঃ আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, (৩৩) যাতে তাদের উপর মাটির ঢিলা নিক্ষেপ করি। (৩৪) যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্যে আপনার পালনকর্তার কাছে চিহ্নিত আছে। (৩৫) অতঃপর সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম। (৩৬) এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি। (৩৭) যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্যে সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি। (৩৮) এবং নিদর্শন রয়েছে মূসার বৃত্তান্তে; যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। (৩৯) অতঃপর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল ঃ সে হয় যাদুকর, না হয় পাগল। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সে ছিল অভিযুক্ত। (৪১) এবং নিদর্শন রয়েছে তাদের কাহিনীতে; যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু। (৪২) এই বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল ঃ তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। (৪৩) আরও নিদর্শন রয়েছে সামূদের ঘটনায়; যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, কিছুকাল মজা লুটে নাও। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এমতাবস্থায় যে, তারা তা দেখছিল। (৪৫) অতঃপর তারা দাঁড়াতে সক্ষম হল না এবং কোন প্রতিকারও করতে পারল না। (৪৬) আমি ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (৪৭) আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী। (৪৮) আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম। (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর। (৫০) অতএব, আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই কথোপকথনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) জানতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ আল্লাহ্‌র ফেরেশতা। অতএব, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি অভিযানে আগমন করেছেন? তারা লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের আযাব নাযিল করার কথা বলল। এই প্রস্তর বর্ষণ বড় বড় পাথর দ্বারা নয়—মাটি নির্মিত কংকর দ্বারা হবে। مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ অর্থাৎ, কংকরগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ চিহ্নযুক্ত হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক কংকরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্যে কংকরটি প্রেরিত হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে। অন্যান্য আয়াতে কওমে-লূতের উপর আপতিত আযাবের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, জিবরাঈল (আঃ) গোটা জনপদকে উপরে তুলে উল্টিয়ে দেন। অর্থাৎ, প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং পরে সমগ্র ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল।

কওমে-লূতের পর মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়, ফেরাউন এবং তার অনুসারীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরাউনকে যখন মূসা (আঃ) সত্যের পয়গাম দেন, তখন বলা হয়েছে ঃ فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ অর্থাৎ, ফেরাউন মূসা (আঃ) -এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বীয় শক্তি, সেনাবাহিনী ও পারিষদবর্গের উপর ভরসা করে। رُكْن এর শাব্দিক অর্থ শক্তি। হযরত লূত (আঃ)-এর বাক্যে اَوْ اٰوِىْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কেয়ামত ও পরকালের বর্ণনা এবং অস্বীকারকারীদের শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার সর্বময় শক্তি বর্ণিত হয়েছে। এতে করে কেয়ামত ও কেয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তার নিরসন হয়ে যায়। এছাড়া আয়াতসমূহে তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং রেসালতে বিশ্বাস স্থাপনের তাকীদ হয়েছে।

بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ – ايد শব্দের অর্থ শক্তি ও সামর্থ্য। এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ তফসীরই করেছেন।

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে গোনাহ্ থেকে ছুটে পালাও। আবুবকর ওয়াররাক ও জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন ঃ প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে গোনাহের দিকে দাওয়াত ও প্ররোচনা দেয়। তোমরা এগুলো থেকে ছুটে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। — (কুরতুবী)